সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ

মো. রাফাত আলম মিশু*

[সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রকবিতার মহাসরণিতে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের অবস্থান স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের পূর্ণতাপ্রাপ্তির উৎসবিন্দুও এই বাংলাদেশ। কেবল উপাদান হিসেবে বাংলাদেশ রবীন্দ্রকবিতায় জায়গা করে নেয়নি, বরং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবি হয়ে ওঠার দার্শনিক ভিত্তিটিও নির্মিত হয় এই বাংলাদেশের মাটি-জল-হাওয়ায়। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষ রবীন্দ্রমননে জন্ম দিয়েছিল বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির বোধ। নদীবিধৌত বাংলাদেশে অবস্থান রবীন্দ্রসৃজনের দিকনির্দেশক অনুষঙ্গ। এই সময়পর্বে রচিত তিন প্রধান কাব্যগ্রন্থ *সোনার তরী*, *চিত্রা*, *চৈতালি*সহ আরও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের কবিতাপাঠের ফলে সেই গুরুত্বের দিকটি অনুভব করা যায়। কবিতার বিষয়নির্বাচন, প্রকরণগত নিরীক্ষা কিংবা তাত্ত্বিক রূপান্তরের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের প্রকৃতি, মানুষ ও জীবনচেতনার সবিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই তিন কাব্যগ্রন্থ পাঠ ও পর্যালোচনা রবীন্দ্রকবিতায় বাংলাদেশের গুরুত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে পরিচিহ্নিত করে।]

রবীন্দ্রজীবনে ও রবীন্দ্রসৃজনে পূর্ববঙ্গ বলে যাকে চিহ্নিত করা হয়, তা-ই বর্তমানের বাংলাদেশ। রবীন্দ্রসৃজনে 'বাংলাদেশ' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপাঠক উভয়ের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ ক্রিয়াশীল থাকে না; কিন্তু এই জনাঞ্চলের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। একাধিক স্থানে রবীন্দ্র-উচ্চারণে এই জনাঞ্চলকে বাংলাদেশ বলে সম্বোধন সেই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়কে সুচিহ্নিত করে। বাংলাদেশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১–১৯৪১) পরম আত্মীয়তা সম্পর্ক ঘোষিত হয়েছে তাঁর রচিত অনেক গানে, গল্পে ও কবিতায়। উনিশ শতকের শেষ দশকে (১৮৯১–১৯০০) বাংলাদেশের শিলাইদহ-সাজাদপুর (শাহজাদপুর)-পতিসরে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান মূলত জমিদারি তদারকিসূত্রে, কিন্তু বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ অল্পকালের মধ্যেই হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতার তীর্থভূমি। তাঁর প্রথম জীবনের বেদ-উপনিষদ পরিস্রুত অভিজ্ঞান বাংলাদেশের সংগ্রামশীল মানুষময় উর্বর জমিনে পায় পূর্ণতা। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির কলকাতা শহরে যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার, রবীন্দ্রনাথ তখন এই নদীময় বাংলাদেশে উদার প্রকৃতি ও প্রাকৃত মানুষের আশ্রয়ে খুঁজে পান জাতীয়তা-অতিক্রান্ত বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবকে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ তাঁকে মুক্তি দেয় কলকাতার ইট-কাঠ-পাথরের সংকীর্ণতা থেকে :

> দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
> লও যত লৌহ লোষ্ট কাষ্ঠ ও প্রস্তর
> হে নবসভ্যতা! ('সভ্যতার প্রতি', *চৈতালি*)

কারণ নগর কলকাতা তিলোত্তমা হলেও তা যে ঔপনিবেশিক পৃষ্ঠপোষকতা ও দানের নির্মাণ, তা ঔপনিবেশিকতার স্বর্ণযুগে জন্ম নেওয়া রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফলে বাংলাদেশ-পর্বের কাব্যসৃজনে নগরসভ্যতাবিমুখতা ও প্রকৃতির সান্নিধ্যসন্ধানের পেছনে কবির বি-ঔপনিবেশিক মনন ক্রিয়াশীল ছিল বলে ধারণা করা যায়।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রবীন্দ্রসৃজনে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের অবস্থান ও প্রভাব তাই সুদূরপ্রসারী। অপরাপর সৃজনের মতো কবিতাতেও এর প্রকাশ প্রত্যক্ষ ও সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কবি রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে অঙ্কিত বাংলাদেশ কত রূপে আবির্ভূত হয়েছে ও রবীন্দ্রজীবনে এর প্রভাবের স্বরূপটি কী, তা জানবার প্রধান মাধ্যম রবীন্দ্র-কবিতাপাঠ। রবীন্দ্র-কবিতাপাঠে পাঠককে বিচিত্র অনুষঙ্গ, তত্ত্ব, মতবাদ ও প্রাকরণিক পরিচর্যা মাথায় রাখতে হয় বটে, কিন্তু স্বয়ং বাংলাদেশ বিবেচিত হতে পারে রবীন্দ্রকবিতার স্বতন্ত্র অনুষঙ্গ হিসেবে। বর্তমান আলোচনায় 'বাংলাদেশ-পর্বে' রচিত তিন কাব্য *সোনার তরী*, *চিত্রা* (১৮৯৬), *চৈতালি* (১৮৯৬) ও সংশ্লিষ্ট আরও কিছু কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাদেশ'কে অনুসন্ধান ও অনুধাবন করার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বাংলাদেশ এসেছে সামূহিক শিল্পচেতনা নিয়ে। বাংলাদেশ রবীন্দ্রমানসে এক নতুন জগৎ, বিশ্বজনীনতার উৎস। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেই তিনি প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করেন বিশ্বমানব, নদীময় প্রকৃতির ভেতর খুঁজে পান বিশ্বপ্রকৃতিকে। *ছিন্নপত্রে* (১৯১২) রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মানসিক ও আত্মিক (রবীন্দ্রনাথ, ১৪২২ : ২২৬)। তাঁর কাছে বাংলাদেশের গ্রামপ্রকৃতি ও নদীময় প্রকৃতি ছিল বহু-কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু অজানিত। নগরাশ্রিত জীবন থেকে গ্রামাশ্রিত জীবনে রবীন্দ্রনাথের আগমন অবনমন তো নয়ই, রবীন্দ্রমানসের বড় ধরনের উত্তরণ। রবীন্দ্রতাত্ত্বিক প্রমথনাথ বিশী এ-প্রসঙ্গে বলেন :

> কলকাতায় বসে এ বাংলাদেশকে দেখতে পাওয়া যায় না। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। ধীরে ধীরে কবির মনে বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তি প্রশস্ত হতে থাকে। (প্রমথনাথ, ১৪১৫ : ৪২)

রবীন্দ্রনাথের সৃজন-অভিযাত্রায় বাংলাদেশ সেই মুহূর্ত, যা রবীন্দ্রমানসকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করে ফেলে : একদিকে প্রাক্-পূর্ববঙ্গ; অন্যদিকে বাকি সমস্ত জীবন ও সৃজন। বাংলাদেশ যে রবীন্দ্রসৃষ্টির প্রধান আশ্রয়, এ-বিষয়ে এখন কেউ আর সন্দিগ্ধ নন :

> বাংলাদেশের হৃদয়ের ভেতরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর জীবনে 'বাংলাদেশ' অধ্যায় সাহিত্যসৃষ্টির বিচারে রত্নগর্ভা হয়ে আছে। অজস্র সোনালি ফসলে পূর্ণ এ অধ্যায়। ... 'বাংলাদেশে' না এলে, রবীন্দ্রনাথ এখন যেমন বাঙালির এবং বিশ্বমানবের পূর্ণাঙ্গ, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সার্বভৌম সাহিত্যস্রষ্টা, তা হতেন কিনা বা হলেও তার ধরনটা কেমন হতো তা অনুমান করা কঠিন। (শামসুজ্জামান, ১৪১৮ : ১২১)

একই প্রসঙ্গে আরও একজন রবীন্দ্রগবেষকের মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে :

> পদ্মাপ্রবাহবিধৌত পূর্ববঙ্গের উদার প্রকৃতি এবং বৃহৎ মানবসংসারে দ্বার যখন তাঁর কাছে অবারিত হয়, আত্মীয়তা স্থাপিত হয় চলমান জীবনের সঙ্গে, তখন স্বভাবতই তাঁর নয়নের সামনে থেকে বহুকালের পুঞ্জীভূত অন্ধকার ঘুচে গেলো। অতঃপর দু-একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত, যেখানেই তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন, সেখানেই ফুটে উঠেছে আলোর অমলকমলখানি। (মুরশিদ, ১৯৮১ : ১০১)

বাংলাদেশের সঙ্গে রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসার সম্পর্ক। তাই তো রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয় : 'পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণে এবং গভীর ভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪২২ : ৮৯)। সরল প্রকৃতির সরল জীবনায়নে প্রকাশের ধরনেও লক্ষ করা যায় সহজিয়া রূপ।

রবীন্দ্রকবিতায় বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি *সোনার তরী* থেকে। এরপর *চিত্রা*, *চৈতালি*, *ক্ষণিকার* (১৯০০) শরীর ছুঁয়ে পুরো রবীন্দ্রজীবনেই সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে বাংলাদেশের বোধ ও নির্যাস। *সোনার তরী*র বহুলপঠিত নামকবিতা 'সোনার তরী'র রয়েছে নানা দার্শনিক ব্যাখ্যা। এর জন্য কিয়দংশে রবীন্দ্রনাথ নিজেই দায়ী। এই কবিতার ব্যাখ্যা তিনি অন্তত তিনবার তিনভাবে দিয়েছেন। কবিতা রচনার পনেরো বছর পর (১৩১৩) বীরেশ্বর গোস্বামীকে লেখা চিঠিতে, সতেরো বছর পর (১৩১৫) 'তরী বোঝাই' শীর্ষক ভাষণে এবং একচল্লিশ বছর পর (১৩৩৯) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা প্রদান করেন রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১১ : ১৬৯–১৭১)। দীর্ঘদিন ছাত্রপাঠ্য থাকার কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রথমোক্ত চিঠির ব্যাখ্যাই 'সোনার তরী'র সঙ্গে সেঁটে আছে। শেষোক্ত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন : "আমার মনে 'সোনার তরী'র যে ইতিহাসটা সত্য হয়ে আছে সেটা হচ্ছে সেই শ্রাবণ-দিনের ইতিহাস"। তাই গুরুতর তত্ত্বতালাশ না করে যদি এই কবিতায় নিখাদ একটি প্রকৃতিচিত্রকে অনুভব করা যায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির সর্বোচ্চ ব্যবহারে, তার মূল্যও কম নয়। 'সোনার তরী'র এই অংশটি যখন পড়া হয় :

একখানি ছোটো খেত, আমি একলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা–
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা। ('সোনার তরী', *সোনার তরী*)

তখন অন্য সবকিছু বাদ দিলেও বর্ষাস্নাত গাঢ় রঙের একটি গ্রামচিত্রের অঙ্কন দেখতে পাওয়া যায়। এবং এই গ্রাম বাংলাদেশের গ্রাম। এই চিত্রাঙ্কন বাংলাদেশ ছাড়া অন্যত্র সম্ভব নয়। ফলে 'সোনার তরী' কবিতায় বাংলাদেশকে অনুভব করা দুর্লক্ষ্য নয়। কেবল রবীন্দ্রকবিতার উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বাংলাদেশ, সামূহিক ও বিচিত্রমাত্রিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিয়ে সে কবিতাকে দিয়েছে নতুন পথের সন্ধান, নতুন ভাবনার খোরাক। *মানসী*-পর্বের (১৮৯০) সুদূরের পিয়াসি রবীন্দ্রমানস *সোনার তরী*তে এসে খুঁজে পেলো বাস্তবের মাটি ও জল– 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। *মানসী*তে যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কল্পলোকের কবি, মানসরাজ্যে প্রতিমা গড়তে ব্যস্ত কবি বাংলাদেশের জলজ হাওয়া ও কর্মচঞ্চল্যের অনুষঙ্গে তিনি পেয়ে যান তাঁর মানসসুন্দরীকে। এই মানসসুন্দরী আর দূরবর্তী কেউ থাকে না, সে যেন অতিচেনা, পৃথিবীর মনুষ্যরূপী। কবির আকাঙ্ক্ষাতেও মানসসুন্দরীর কাছে তাঁর মর্ত্যপ্রীতি ও মানবনিষ্ঠা জেগে ওঠে :

মানসীরূপিনী ও গো বাসনাবাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কি গো মূর্তিমতি হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী? ('মানসসুন্দরী', *সোনার তরী*)

এছাড়াও এ-কাব্যে যেখানে প্রত্যক্ষত বাংলাদেশ নেই, সেখানেও আছে বাংলাদেশের ভাবনির্যাস। 'দুই পাখি' কবিতায় রূপকের আধারে কবির কলকাতা ও পূর্ববঙ্গ– এই দুই সত্তার দ্বৈরথ অনুভব করা যায়। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার শুরুতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিচ্ছেন এ-কবিতা

লিখেছেন 'পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া', তা সত্ত্বেও এ-বিশ্বজনীন বোধ যে বাংলাদেশ-উৎসারিত তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর *ছিন্নপত্রের* অমলিন পত্রগুচ্ছে। পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন বলেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন 'বসুন্ধরা' কবিতা, বসুন্ধরাকে সম্বোধন করতে পেরেছিলেন জননী বলে, বলতে পেরেছিলেন :

ইচ্ছা করে, বারবার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে। ('বসুন্ধরা', *সোনার তরী*)

বাংলাদেশের বিশ্বপ্রকৃতিই তাকে করেছে আদিপ্রাণোৎসসন্ধানী। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :

> কবি মর্তপ্রীতি ও মর্মস্পর্শী আবেদন এবং গভীরতম বিজড়নে *সোনার তরী*তে বসুন্ধরাকে আঁকড়ে ধরেছেন। এত নিবিড় সবল মর্তচেতনায় অভিভূত হয়েছেন যে, বলতেই হয় রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রাণকে, প্রাণময় পৃথিবীকে প্রবল সত্য হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। ... গ্রামবাংলার উদার কর্মময় জীবনচাঞ্চল্য ও প্রকৃতির প্রবহমান সৃষ্টিলীলার পাদপীঠে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন এক প্রাণচঞ্চল বিশ্বজগতের ভাবসত্য। (আকতার, ২০১৯ : ১৫২)

এই জনচঞ্চল প্রকৃতিলোক রবীন্দ্রমননে তৈরি করে এক নিভৃত লোক। প্রকৃতিকে একান্ত করে দেখার ও ভাবার সুযোগ পান তিনি। তাই বাস্তব জগতের এই কাদা-মাটি-মানুষের প্রকৃতি তাকে সহজেই অবগাহন করায় অন্য কোনো লোকে। বাস্তবের প্রকৃতি থেকে তিনি যেমন ধাবিত হতে পারেন অসীমের পথে, আবার এই প্রকৃতি তাকে করে অতীতচারী; কখনও নিয়ে যায় তাঁর শৈশবসন্ধ্যায়। 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতার যে গ্রামচিত্র তা কবির চোখে দেখা সরল-সাধারণ গ্রাম, বাংলাদেশের এক নিভৃত পল্লি :

ওই যে সম্মুখে
প্রান্তরের সর্বপ্রান্তে, দক্ষিণের মুখে,
আখের খেতের পারে, কদলী সুপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম, হোথা আঁখি ধায়।
হোথা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্যপানে, নাহি আগুপিছু। ('শৈশবসন্ধ্যা', *সোনার তরী*)

বাংলাদেশের গ্রামচিত্রের এই সহজতা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মধুর শৈশবে ও শৈশবের স্মৃতিময় সন্ধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ-দর্শনের প্রধান অনুষঙ্গ নদী। পদ্মা-ইছামতি-গড়াই-আত্রাই-যমুনা প্রভৃতি নদী রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ-অনুধ্যানের প্রধান সঙ্গী। বাংলাদেশকে তিনি যেমন নদীপথে দেখেছেন, একইসঙ্গে এই নদীর নিজস্ব সত্তাটিও আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। নদীযাত্রায় নদী ও নদীতীরবর্তী প্রকৃতি ও মানুষ কবিসত্তাকে জারিত করেছে নতুন বোধ ও সংবেদনায়। রবীন্দ্রকবিতায় নদীপথ এসেছে তার স্বয়ংরূপ নিয়ে :

তীরেতে তরুরাজি দোলে
আকুল মর্মর-রোলে।
চিকুর চিকিমিকে
চকিয়া দিকে দিকে
তিমির চিরি যায় চলে।
তীরেতে তরুরাজি দোলে। ('নদীপথে', *সোনার তরী*)

বিশেষ বিশেষ নদী হয়ে উঠেছে কবির অর্ঘ্য নিবেদনের স্থান। *চৈতালির* 'পদ্মা', 'ইছামতী নদী' প্রভৃতি কবিতায় প্রকাশিত হয় কবির নিঃসংকোচ নিবেদন ও সমর্পণ :

হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।
একদিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরান। ('পদ্মা', *চৈতালি*)

নদীর ঋতুভিত্তিক নানা রূপ যেমন ধরা পড়ে, তেমনি কখনো বা নদীর ওপর আরোপ করেন মানবিক সত্তা, নির্মাণ করেছেন নদীর দার্শনিক ব্যাখ্যা :

বরষার ভরা নদী তৃপ্ত শিশুপ্রায়
নিস্তরঙ্গ পুষ্ট-অঙ্গ নিঃশব্দে ঘুমায়। ('নদীযাত্রা', *চৈতালি*)

নদী রবীন্দ্রমানসের প্রাণসত্তার প্রতীক। উন্মত্ত পদ্মার পাশাপাশি শান্ত ইছামতি কিংবা স্রোতস্বিনী গড়াই কোনো রূপই রবীন্দ্রদৃষ্টি এড়ায় না। তাই নদী জীবনগতির অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে রবীন্দ্রকবিতায় উপস্থিত থাকে। প্রকাশিত হয় প্রিয় নদীর প্রতি কবির অকৃত্রিম শুভকামনা :

অয়ি তন্বী ইছামতী, তব তীরে তীরে
শান্তি চিরকাল থাক্ কুটিরে কুটিরে –
শস্যে পূর্ণ হোক ক্ষেত্র তব তটদেশে। ('ইছামতী নদী', *চৈতালি*)

আবার, প্রকৃতির সৌন্দর্যচিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে কবির অবচেতনে নির্মিত হয়ে যায় চিরায়ত 'কৃষ্ণ' মিথ :

ঝিলিমিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো।
আমি ভাবিতেছি কার আঁখিদুটি কালো।
কদম্বগাছের সার,
চিকন পল্লব তার
গন্ধে-ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো।
কারে বলিবারে চাহি কারে বাসি ভালো। ('ভরা ভাদরে', *সোনার তরী*)

*সোনার তরী*তে অঙ্কিত ছবিতে কবি ব্যবহার করেন গাঢ় ও প্রগাঢ় রং। জগৎ ও জীবনপ্রীতির উদ্বোধনের কাব্য *সোনার তরী*। রবীন্দ্র-প্রকৃতিদর্শনের প্রারম্ভিক বিন্দুটিও এই কাব্য থেকে শুরু। আর এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিবোধ নির্মাণে বাংলাদেশের প্রকৃতির উপস্থিতি ও প্রভাবের স্বরূপ সম্পর্কে উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রসৃজনে *সোনার তরী* নানা অর্থেই বাংলাদেশের কাব্য।

*চিত্রা*র কবিতাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য এর চিত্রময়তা, অন্তত বাংলাদেশ-দর্শনের দিক থেকে। *চিত্রায়* অধ্যাত্মানুসন্ধানের সমান্তরালে বিকশিত হতে দেখা যায় বস্তুজগতের রূপ-রস-গন্ধ। *সোনার তরী*র বিশ্বচেতন *চিত্রা*তে প্রগাঢ়; *সোনার তরী*র চিত্রবোধ এখানে আরও বাস্তব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই কাব্যদ্বয়ে রবীন্দ্রমননের বস্তুপৃথিবী নির্মাণের এই প্রবণতা প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য :

> 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যেই তাহার জীবন নিজের মনের বস্তুহীন কল্পনার মধ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বস্তুময় বৃহত্তর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের রূপও এক নূতন সৌন্দর্যময় আনন্দময় রূপে কবির চোখে ধারা পড়িল; শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান সবল কল্পনা ও গভীরতর ভাবরহস্যে সমৃদ্ধিলাভ করিল। (নীহাররঞ্জন, ১৩৬৯ : ৬৩)

মানসসুন্দরীর মধ্য দিয়ে যে আকাঙ্ক্ষার কথা কবি জানান দেন *সোনার তরী*তে, তাকেই *চিত্রা*-পর্বে পেয়ে যান 'জীবনদেবতা'রূপে। এই জীবনদেবতা কবির অধিসত্তাই বটে, যা ছিল কবির বহুকাঙ্ক্ষিত। এই জীবনদেবতার উৎসারণোৎস মাটি-মানুষ ও জীবন। বস্তু-জীবনকে ছেনেই রবীন্দ্রনাথ সন্ধান পান তাঁর অধিজীবনের জীবনদেবতার। একইসঙ্গে কবির পূর্ববঙ্গকে দেখার ক্ষেত্রেও আসে নতুনত্ব। পূর্ববঙ্গ এখানে হয়েছে চিত্রবহুল, বর্ণবহুল। সেই চিত্র হয়েছে স্পষ্ট ও বাস্তবনিষ্ঠ। যেমন, 'সুখ' কবিতায় দেখা যাবে কবির প্রিয় পদ্মা নদী ও পদ্মার চলমান চিত্র। চলমানতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে দৃশ্যচিত্র অঙ্কন করেন, সেখানে ধরা পড়ে কবির চালচ্চিত্রিক পরিচর্যা :

ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে। ('সুখ', *চিত্রা*)

এই কবিতাতে আরও পাওয়া যায় জলে আকণ্ঠমগ্ন গ্রামবধূদের কৌতুকালাপ, নৌকায় বসে বৃদ্ধ জেলের জালবোনা, উলঙ্গ বালকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সতেজ চিত্ররূপ, আম্রমুকুলের গন্ধ ও বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর। এসব ইন্দ্রিয়চেতনার সংযোগ ঘটছে রবীন্দ্রনাথের চলমানতার মধ্য দিয়ে। এই বাস্তবচিত্র অঙ্কনের পরপরই সুখ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করছেন :

বিশ্ববীণা হতে উঠি গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি নিথর গগন। ('সুখ, *চিত্রা*)

বাস্তবের রূপ অঙ্কন ও তৎক্ষণাৎ মানসপরিক্রমণ ও এ-দুয়ের মিথস্ক্রিয়া রবীন্দ্রসত্তার অনন্য দিক। দৈনন্দিন জীবনের আরও অনেক ইন্দ্রিয়ঘন চিত্ররূপের পরিচয় পাওয়া যাবে চিত্রার একাধিক কবিতায় :

তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি – কানে আসিতেছে বারে বারে
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর –
কার কেশপাশ হতে খসি পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনাপ্রবাহ।' ('জ্যোৎস্নারাত্রে', *চিত্রা*)

দৃশ্য ও শব্দের সমানুপাতিক অবস্থান *চিত্রা*র বৈশিষ্ট্যকে প্রোজ্জ্বল করেছে। পতিসরে অবস্থানকালে এক সন্ধ্যার রূপ কবি নিরীক্ষণ করছেন এবং পল্লিপ্রকৃতিকে বিশ্বপ্রকৃতির উপমান করে তুলছেন :

আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির

একেকটি দীপ্ত তারা, সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মতো। ('সন্ধ্যা', *চিত্রা*)

চিত্রা-পর্বে রবীন্দ্রনাথের সুদূরের আকাঙ্ক্ষা ও যাত্রাও যেন জনজীবনলগ্ন। সৌন্দর্যতত্ত্বে যুক্ত হচ্ছে বস্তুপৃথিবীর জীবনায়ন। পৌরাণিক বোধে অনুভব করা যাচ্ছে দৃশ্যগ্রাহ্য সমকালীন জীবন ও জগৎ। তাই প্রাচীন ভারতীয় সুন্দরের প্রতিমা নন্দনবাসিনী উর্বশী নির্মাণে অনুভব করা যায় রক্তে-মাংসে গড়া মাটির পৃথিবীর নারীরূপকে; বিশ্বরূপের সমার্থক হয়েও যে একজন মানবী। রবীন্দ্রলোকে বাংলাদেশের প্রকৃতি সংসার ও অসীমতার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তৈরি করেছে এক ত্রিশঙ্কু অবস্থা। তাই কবিকে বলতে হয় :

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর,
ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়। ('এবার ফিরাও মোরে', *চিত্রা*)

মর্ত্যপ্রীতি কত প্রবল হলে কবি লিখতে পারেন 'স্বর্গ হতে বিদায়', এবং বলতে পারেন : 'স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি–' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪২২ : ৫২), তা সংবেদনশীল কবিতাপাঠকমাত্রই অনুভব করতে পারেন। জীবনের বৃহত্তর ব্যঞ্জনা নির্মাণে কবি আশ্রিত হন বাংলাদেশের প্রকৃতির ক্রোড়ে :

যৌবননদীর স্রোতে তীব্র বেগভরে
একদিন ছুটেছিনু; বসন্তপবন
উঠেছিল উচ্ছ্বসিয়া; তীরউপবন
ছেয়েছিল ফুল্ল ফুলে; ('প্রৌঢ়', *চিত্রা*)

তাই *চিত্রা*র অধিবাস্তববাদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তববাদে সমর্পিত ও সুগঠিত। কারণ *চিত্রা*র জীবনদেবতার ধারণাও নিসর্গোৎসারিত। দৃশ্যমানতার মধ্য দিয়ে বাস্তব পৃথিবীর নিসর্গলোকই সেই অধিবাস্তবিক জীবনদেবতাপ্রাপ্তির মূল শক্তির জায়গা।

পূর্ববঙ্গীয় নিসর্গলোকীয় হয়েও সর্বজনীন ব্যঞ্জনার কাব্যরূপ হয়ে ওঠে *চৈতালি*। বাংলাদেশে তথা পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রাপ্তিযোগ বাংলাদেশের মধ্যাহ্নের সৌন্দর্যসন্ধান। বাংলার প্রকৃতির মধ্যে নিস্তব্ধতা, শান্ততা ও বিপুল বৈরাগ্য নিয়ে যে দুপুর আশ্চর্য সৌন্দর্য নিয়ে প্রতিদিন আবির্ভূত হয়, তার শিল্পিত প্রকাশ প্রথম সম্পন্ন হয় রবীন্দ্রসৃজনে। *ছিন্নপত্রে*র ২৭ সংখ্যক পত্রে বাংলাদেশের দুপুরের নিজস্বতা কবির প্রশ্রয়ে যে সুন্দরতম প্রহরে পরিণত হয়, তারই কাব্যরূপ পায় 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় :

মধ্যাহ্নের অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী। ('মধ্যাহ্ন', *চৈতালি*)

এই অনুভবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রকৃতির জঠরে আবিষ্কার করলেন নিজের আদি জন্মস্থল। তিনি বলেন :

ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে। ('মধ্যাহ্ন', *চৈতালি*)

যদিও এর ঐতিহাসিক ও তথ্যগত সত্যতাও আছে, কিন্তু কবিসত্তার আদি জন্মস্থলের ঘোষণার কাছে ইতিহাসের প্রামাণিকতা তুচ্ছ। কবির মনোভূমিই জন্মভূমি। অন্য অর্থে বাংলাদেশের মাটি রবীন্দ্রসৃজনেরই উর্বর ভূমি।

বাংলাদেশ-পর্বের কবিতায়, বিশেষত *চৈতালি-ক্ষণিকায়* তো মানুষেরই আনাগোনা। সেই মানুষ নানা পেশার, নানা রূপের; প্রান্তিক মানুষ, সরল মানুষ, কাজের মানুষ। রবীন্দ্রপ্রকৃতিদর্শন জননিরপেক্ষ নয়। মানুষ ও নিসর্গের সমবায়ে গড়ে ওঠে রবীন্দ্রপ্রকৃতিচেতনার পূর্ণ বলয়। চাষি, জেলে, গ্রামবধূ, দুরন্ত বালক, ভৃত্য কোনো কিছুই কবির দৃষ্টি এড়ায় না। নদীতীরবর্তী একান্ত প্রাকৃতজনদের বাস্তবের মানুষরূপেই কবি তাঁর কবিতায় স্থান দিয়েছেন। ফলে রবীন্দ্রকাব্যে মানুষের উপস্থিতি নেই– এমন অভিযোগ যৌক্তিক নয়। 'দিদি' কবিতায় নদীতীরে দেখা মুহূর্তের অনুভবে বাংলাদেশের এক সাধারণ মেয়ের অসাধারণ ছবি আঁকা হয়ে যায়। 'পুঁটু' কবিতায় চৈত্রের মধ্যাহ্নের রূপাঙ্কনের মধ্যে পুঁটু-নাম্নী মহিষ-কন্যা ও মনুষ্য-যুবকের আন্তরিক সম্পর্কের ছবিটিও আঁকা হয়ে যায়। *ক্ষণিকার* 'অকালে' কবিতায় গ্রামীণ হাটের চিত্র– নৌকা হাঁকাহাঁকি, ছুটাছুটি। গ্রামীণ সরল জীবনায়নের এমন অনেক ছোট ছোট পটচিত্র জুড়ে দিয়ে নির্মিত হয় জনলোক ও প্রকৃতিঘনিষ্ঠ বাংলাদেশচিত্রের একটি কোলাজরূপ। *চৈতালি* কাব্যের শিল্পপ্রবণতা সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেন :

> শ্রেণীগত হিসাবে 'চৈতালি' পূর্বের কাব্য দুখানি হইতে স্বতন্ত্র নহে – কেবল ইহা ঐ দুখানি গ্রন্থ হইতে খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পূর্বে যাহা কেবল সামান্যত সত্য ছিল এখানে তাহা বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে ছিল 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি'র জন্য আকাঙ্ক্ষা, এখানে তাহার পরিচয়। (প্রমথনাথ, ১৪১০ : ৮১)

চৈতালির কবিতাগুলো বাংলাদেশের লোকায়ত রূপকে নিজের ভেতর ধারণ করে আরও বেশি প্রাণবান। একইভাবে *কল্পনার* (১৯০০) কবিতার মধ্যে মানুষের তুলনায় প্রকৃতির প্রাচুর্য বেশি। যেমন, 'শরৎ', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'বর্ষশেষ' প্রভৃতি কবিতার যে প্রকৃতিচিত্র পাওয়া যায়, তা নিখাদ বাংলাদেশরই প্রকৃতি। *ক্ষণিকার* কবিতাগুলোতে আবার প্রকৃতি ও মানুষের সামবায়িক রূপ লক্ষণীয়। আপাত সরল শৈলীবিন্যাসের মধ্যে কবির পূর্ববাংলাকেন্দ্রিক অনুভূতির ছটা প্রকাশিত হয়েছে এই কাব্যে। শিলাইদহ অবস্থানকালে জ্যৈষ্ঠের ২০ তারিখে কবি লিখেছেন 'আষাঢ়' কবিতা : 'নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে, তিল ঠাঁই আর নাহিরে।' বর্ষার চিরায়ত সত্তাটি কবির অনুভবে বাংলাদেশের প্রকৃতির অনুষঙ্গে হয়ে ওঠে অনন্য। বাংলাদেশের প্রতিটি ঋতু স্পর্শিত হয়েছে রবীন্দ্রকাব্যবোধিতে, যেমনভাবে প্রতিটি নদী, নদীর তীর, তীরবর্তী মানুষ, মানুষের কর্ম কবির ভালোবাসার আশ্রয় ও প্রশ্রয়। আপাত সামান্যও কবির চোখে আবির্ভূত হয় অসামান্য ব্যঞ্জনা নিয়ে :

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকীর ঘর। ('দুই তীরে', *ক্ষণিকা*)

'সোনার তরী' কবিতায় প্রাপ্তির যে অসম্পূর্ণতা ছিল তা যেন নয় বছর পরে লেখা 'যাত্রী' কবিতায় পেয়ে যায় পূর্ণতা :

আছে, আছে স্থান!
একা তুমি, তোমার শুধু
একটি আঁটি ধান
নাহয় হবে, ঘেঁষাঘেষি,
এমন কিছু নয় সে বেশি,
নাহয় কিছু ভারী হবে
আমার তরীখান –
তাই বলে কি ফরবে তুমি
আছে, আছে স্থান! ('যাত্রী', *চৈতালি*)

সরল বর্ণনা, সাধারণ গ্রামচিত্রের মধ্যে চলে কবির অসীমতা অন্বেষণ। *ক্ষণিকার* মধ্যদিয়েই রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ-পর্বের বলয়টি পূর্ণ হয়েছে।

কথা (১৯০০) ও *কাহিনী* (১৯০০) কাব্যদ্বয় এবং পরবর্তীকালের *নৈবেদ্য* (১৯০১) কাব্যে রবীন্দ্রমানসের পরিচয় দিতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রভাবের কথা বলা হয়। বিশেষ করে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ও অনুগমন। এই মাত্রাকে গ্রহণ করে নিয়েও প্রাচীন ভারতমুখিতার পেছনে বঙ্গভূমির উদার প্রকৃতিলোক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থা রবীন্দ্রমননে ক্রিয়াশীলতাকে সমর্থন করা যেতে পারে। কবির স্থানগত বা কালগত অবস্থানের চেয়ে ওই স্থান ও কালের ভাবগত ব্যাপকতা ও গভীরতা রবীন্দ্রসৃজনে বড় বিষয় হিসেবে এসেছে। এ-কারণে দেখা যায়, বাংলাদেশের স্মৃতি পূর্ববঙ্গে অবস্থানপর্বের পরেও নানা সময়ে নানা কাব্যে ও সাহিত্যে উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে থাকে। *বলাকা* (১৯১৬) কাব্যে কথিত গতিবাদের জন্য দূর-পাশ্চাত্যে না গিয়ে পদ্মার গতি থেকেই তার তত্ত্বনির্যাসটি পাওয়া যেতে পারে। *পুনশ্চের* (১৯৩২) যুগেও রবীন্দ্রমানসে পদ্মা সমুজ্জ্বল :

পদ্মা চলেছে কোথায় দূর আকাশের তলায়
মনে মনে দেখি তাকে। ('কোপাই', *পুনশ্চ*)

স্বয়ংসম্পূর্ণ নদীময় বাংলাদেশের গ্রামচিত্রের এমন অঙ্কন ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রসৃজনের সমগ্রটা জুড়ে। তাঁর জীবনের সায়াহ্নকালে (১৯৪০) *সোনার তরী* (১৮৯৪) কাব্যের সূচনাংশে তিনি লিখেছিলেন :

> বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি নে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ('সূচনা' : *সোনার তরী*)

এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সত্তায় বাংলাদেশ যে কতটা গভীরভাবে বিরাজমান এবং এর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা কত সুনিবিড় তা-ই ঘোষিত হয়েছে। রবীন্দ্রকবিতার বাংলাদেশ-পর্বের আলোচনায় শেষ পর্যায়ে আরও একটি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। *ক্ষণিকার* 'কর্মফল' কবিতার কবি আত্মঘোষণা করেন :

পরজন্ম সত্য হলে
কী ঘটে মোর সেটা জানি –

আবার আমায় টানবে ধরে
বাংলাদেশের এ রাজধানী।
গদ্য পদ্য লিখনু ফেঁদে,
তারাই আমায় আনবে বেঁধে,
অনেক লেখায় অনেক পাতক,
সে মহাপাপ করব মোচন –
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন। ('কর্মফল', *ক্ষণিকা*)

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিকর্মের পাপমোচন করতে সংশয়াত্মক পরজন্মে ফিরে আসতে চাইলেন বাংলাদেশের রাজধানীতে। এই রাজধানী সুচিহ্নিত নয়; রাজধানী ঢাকা নিশ্চয়ই নয়। তবুও কবির ঘোষণার মধ্য দিয়ে পাঠকচিত্তে প্রশ্ন উঁকি দিতেই পারে, রবীন্দ্রসৃজন-অনুধ্যানের ভবিষ্যৎ তবে কি বাংলাদেশেই?

রবীন্দ্রকাব্যসৃজনে বাংলাদেশ সেই অধ্যায়, যেখানে পূর্বের অরূপতাকে রূপান্বিত করে কবি ধাবিত হয়েছেন অসীমতার দিকে। বাংলার মুক্ততা ও উদারতা তাঁকে সুযোগ করে দিয়েছে অনেককিছু বলার। অনেক অব্যক্ত হয়েছে সর্বব্যক্ত। কবিতার আকারও পেয়েছে কাঠিন্য থেকে মুক্তি। ক্রিয়াপদের প্রাকৃত ব্যবহারও এই পর্ব থেকেই লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ রবীন্দ্রসৃজনের বাঁক-নির্ণয়ী কাল, কবির আসমান-জমিনের সংযোগস্থল, বিশ্বমানবিক অভিযাত্রার সূচনা। রবীন্দ্রকাব্য অভিসারের মিলন-পর্ব এই বাংলাদেশ, যার অনিবার্য বিরহ-ভাবসম্মিলনের সম্প্রকাশ দেখা যায় বাকি জীবনের কাব্যসাধনায়।

সহায়কপঞ্জি

গোলাম মুরশিদ (১৯৮১)। *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
নীহাররঞ্জন রায় (১৩৬৯)। *রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা*। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কলকাতা।
প্রমথনাথ বিশী (১৪১০)। *রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা।
প্রমথনাথ বিশী (১৪১৫)। *শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা।
বেগম আকতার কামাল (২০১৯)। *রবীন্দ্রকবিতার বাতায়ন*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১১)। 'রচনাপ্রসঙ্গ', *সোনার তরী*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪২২)। *ছিন্নপত্র*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।
শামসুজ্জামান খান (১৪১৮)। 'রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ, বাংলাদেশের রবীন্দ্রনাথ'। *উত্তরাধিকার*, সম্পাদক : শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।